সময়ের সাতকাহন

তাহমিনা জামান

‘কÔUv ev‡R?Õ ÔmvZUvq evm| nv‡Z GK`g mgq †bBÕ Ôci‡bv †mB w`‡bi K_v...Õ wKsev Ô†ZwÎk eQi †K‡U †Mj, †KD K_v iv‡Lwb|Õ সময় সম্পর্কিত অতি পরিচিত সংলাপ এগুলো। এমন হাজারো কথা আমরা হরহামেশাই শুনছি। কারণ জীবন এখন ঘড়ির কাঁটায়, ক্যালেন্ডারের পাতায়। সময়ের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কিন্তু কখন বাঁধা পড়লাম সময়ের সাতপাঁকে? অজান্তে না জেনেশুনে? এই ‘সময়’টাই বা কি? কখনো কি ভেবেছি এভাবে? সম্ভবত না।

অন্ধের হাতি দেখার পুরাতন গল্পটি মনে পড়বে ‘সময়’ কি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে। কোনো পদার্থবিদ বলবেন, সময় মহাবিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটি প্রপঞ্চ। সায়েন্স ফিকশন পাঠকের কাছে সময় চতুর্থ মাত্রা। ব্যবসায়ীর কাছে তা টাকা বৈ কিছু নয়। এক কথায়, সময়ের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কারো কাছেই নেই। অথচ এই সময়ের সঙ্গেই কিনা আমাদের তুখোড় ‘প্রেম’।

খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে লেখা হোমারের ইলিয়াড। সময়ের সঙ্গে মানুষের প্রেম তখনো মাঠে গড়ায়নি। কাজেই মহাকাব্যটির চরিত্রগুলোর কোনো অতীত নেই। নেই স্মৃতি রোমন্থন। কোন কালের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ নয় তারা। হোমার সময় সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন, ব্যাপারটি এমন নয়। আসলে সময়কে উপস্থাপন করার মতো পর্যাপ্ত ভাষাগত উৎকর্ষতা তখনো অর্জিত হয়নি।

অর্জনের চেষ্টা ছিল। সেই আদিকাল থেকেই। মানুষ সময় সচেতন হয় সম্ভবত প্রকৃতির ক্রমাগত পরিবর্তন দেখে। চাঁদ-সূর্যের আবর্তন আর ঋতু বদল জন্ম দেয় সময়ের ধারণার। প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতায় সময়কে জানার চর্চা ছিল। ২০ হাজার বছর পূর্বে বরফযুগেও। সে সময় ইউরোপে শিকারি মানুষেরা হাড় আর রশির গেরোতে সময়কে বাঁধার চেষ্টা করেছে।

ছয় সহস্রাব্দ আগে মধ্যপ্রাচ্যে গড়ে ওঠে দুটো উন্নত সভ্যতা। দজলা-ফোরাতের তীরে সুমেরীয় সভ্যতা। নীলনদের তীরে মিশরীয়দের। ব্যাবিলনবাসী অর্থাৎ সুমেরীয়রা বছরকে ৩৬০ দিনে ভাগ করতে পেরেছিল। আবার বছরকে ১২ মাসে এবং প্রতিটি মাসকে ৩০ দিনে। কাজটা সহজ ছিল না। চন্দ্র-সূর্যের আবর্তনকাল সমান নয়। চাঁদ প্রায় প্রতি সাড়ে ২০ দিনে পৃথিবীকে ঘুরে আসে। পৃথিবী সূর্যকে ঘুরে ৩৬৫- ১/৪ দিনে। ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদরা জানতেন বছরের সঠিক দিন সংখ্যা। ৩৬০ দিনে বছরকে সীমাবদ্ধ রাখা হয় মূলত পুরোহিতদের অনুরোধে। তাদের বিশ্বাস, ১২ চক্রে বিভক্ত এই দিন সংখ্যায় লুকিয়ে আছে অলৌকিক শক্তি।

মিশরীয়রা ছিল বাস্তববাদী। তারা বছরে আরো পাঁচ দিন যোগ করে। নীলনদের

বাৎসরিক বন্যার সময় এই অতিরিক্ত দিনগুলোতে ভোজ উৎসব হতো। সময়-সচেতন মিশরীয়রা প্রতিটি দিনকে ভাগ করে দু'ভাগে। প্রতি ভাগে ১২ ঘন্টা। গণনার হিসাব তারা ধার করেছিল সুমেরীয়দের কাছ থেকে। কিংবা ধারণা পেয়েছিল আকাশে বিছানো নক্ষত্রের বিন্যাস দেখে।

সময় গণনার পদ্ধতির উন্নতি ঘটায় রোমানরা। ১৮৫২ সাল। পোপ এয়োদশ গ্রেগরী প্রণয়ন করেন 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার'। আমরা পাই আধুনিক দিনপঞ্জিকা। দারুণ

(KKIqvBR) Px‡bi hv`N‡i m mO-Gi RjNwoi cwZKwZ; M¨vwjwjli †ciYv wcmvi wMRvi Kwc ewZ; weÁvc‡b e¨vW wcU: ci"liv nvZNwo civ ïi" K‡i c_g wekh‡×i ci ; e‡U‡bi cvPxb mgq M‡elYv †¶Î †÷vb †nÄ

সেসব হাতঘড়ির। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অবস্থা বদলায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বারবার বুক পকেট হাতড়ে ঘড়ি বের করাটা ছিল বিরাট ঝামেলা। কাজেই যুদ্ধ শেষে ছেলেদের কব্জিতেও শোভা পেতে থাকে হাতঘড়ি।

আজকে বিশ্বে সবচে' বেশি যে যন্ত্রটি তৈরি হয় তার নাম ঘড়ি। বাজি ধরে এ কথা বলা যায়। একমাত্র আমেরিকাতেই দৈনিক ৩ লাখ ঘড়ি তৈরি হয়। এই হিসাব '৯০ সালের। জাপানের সিকো গ্রুপ বিশ্বের সবচে' বড় ঘড়ি নির্মাতা। তাদের ৪.৫ একর বিস্তৃত কারখানায় প্রতি দুই সেকেন্ড একটি ঘড়ি প্রস্তুত হয়।

সিকো ১৯৬৯ সালে প্রথমবারের মতো বাজারজাত করে কোয়ার্টজ ঘড়ি। ব্যাটারিচালিত এই ঘড়িতে একটি স্ফটিক বসানো থাকে। ছোট কাঁটা চামচের মতো দেখতে এই স্ফটিক সেকেন্ডে ৩২ হাজার ৭৬৮ বার কাঁপে। ছোট্ট সার্কিটে থাকা ইলেকট্রিক সুইচ এই কম্পনকে ডায়ালের ঘূর্ণিতে রূপান্তর ঘটায়। ডায়ালযুক্ত বা ডিজিটাল উভয় ঘড়িতেই এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। কোয়ার্টজ প্রযুক্তি ব্যবহারে ঘড়ির দাম হ্রাস পায়। ব্যবহার বাড়ে ঘড়ির। মানুষ বাধা পড়ে সময়ের সাতপাঁকে। ব্যাপারটি যে তার জ্ঞাতসারেই ঘটেছে এ কথা হলফ করে বলা চলে।

কার্ল মার্কস ঘড়ি এবং পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাখা দিয়েছেন কি না, আমরা জানি না। তাই বলে সময় রক্ষণের সঙ্গে পুঁজিবাদ বিকাশের সম্পর্ককে অস্বীকার করার জো নেই। ১৭ শতক থেকেই ঘড়ি তথা সময়ের হিসাবরক্ষক সমাজে গভীর প্রভাব

নিখুঁত এই পঞ্জিকা। ৩৩২৩ বছরে মাত্র একদিন এদিক-ওদিক হবার সম্ভাবনা।

সময়কে আরো নিখুঁতভাবে জানতে কী করতেন আমাদের আদি মাতাপিতারা? সম্ভবত আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখেই তারা কাজটি সেরে নিতেন। আমাদের দেশে এখনো অনেকে এভাবেই সময়ের হিসাব রাখেন। সময়ের স্থূল ধারণা ক্রমশ বদলাতে থাকে। সূর্যঘড়ি উদ্ভাবিত হয়। মাটিতে পোতা একখন্ড লাঠির ছায়া দেখে সময়ের হিসাব রাখা শুরু হয়। ১১ শতকে সু সঙ নামে এক চীনা পন্ডিত রীতিমত বিপ্লব ঘটান। বিশাল আকৃতির এক জলঘড়ি আবিষ্কার করেন তিনি। এটাই সম্ভবত প্রথম 'যান্ত্রিক জল ঘড়ি'। বেইজিং যাদুঘরে গেলে দেখা যাবে সেই ঘড়ির এক সুবিশাল প্রতিকৃতি। ৩০ ফুট উচু জলচক্র। পানির ধাক্কায় ঘুরে চলেছে।

সময়ের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সময়ে এভাবেই। ক্রমশ তা এগোয় পরিণয়ের দিকে। সু সঙ বানিয়েছিলেন জলঘড়ি, পৃথিবীর প্রথম যান্ত্রিক সময়রক্ষক। ইউরোপ নির্মাণ করে আধুনিক ঘড়ি। ত্রয়োদশ শতকে এক ইংরেজ মঠের জন্য নাম না জানা এক কামার তৈরি করে যান্ত্রিক ঘড়ি। পেটানো লোহা আর ওজন দিয়ে তৈরি এই ঘড়ির কোন কাঁটা ছিল না। অনেকটা উল্টো চরকি কলের মতো দেখাত। ঘড়ির সময় ধরে ঘন্টা বাজিয়ে প্রার্থনার আহ্বান করা হতো। মধ্যযুগের ইংরেজিতে ঘন্টা (Bell)-কে বলা হতে Clok। সেখান থেকেই এসেছে Clock।

ইটালির পিসায় গেলে একটি ল্যাম্প দেখে আসবেন অবশ্যই। কিংবদন্তি আছে, ১৬ শতকে চিকিৎসা বিদ্যার এক তরুণ ছাত্র চার্চে এই ল্যাম্পকে ঝুলতে দেখে। বাতাসে দুলছিল বাতিটা। দোল খাওয়ার বেগের সঙ্গে ছাত্রটি নিজের হৃদস্পন্দনের বেগের আশ্চর্য মিল খুঁজে পায়। কুপিবাতিটা প্রতিটি দোলে যত দূরই যাক, সময় নিচ্ছিল একই।

এভাবেই আবিষ্কৃত হয় পেন্ডুলাম। ছাত্রটিও চিকিৎসাবিদ্যা ছেড়ে পদার্থবিদ্যায় মন দেয়। জানতে চান ছাত্রটির নাম? গ্যালিলিও গ্যালিলি। সাত দশক পর ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হুইজেন আবিষ্কার করেন প্রথম পেন্ডুলাম ঘড়ি। নিখুঁত সময়রক্ষণের যুগ শুরু তখন থেকে।

সময়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি আরো পরে। শ'চারেক বছর আগে বহনযোগ্য ঘড়ির উদ্ভব ঘটে। প্রথম দিকে কোমরবন্ধনী বা গলায় ঝুলিয়ে রাখা হতো, পরে তা পকেটে ঢুকে পড়ে। ১৮৬০ সালে আমেরিকায় পকেট ঘড়ির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। সে সময় ব্র্যাসলেটে লাগানো ঘড়িও বাজারে আসে। যা কেবল মহিলারাই পরতো। কারুকাজময় বলে ছেলেদের মাঝে বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল না

বিস্তার করতে থাকে। বিকাশমান পুঁজিবাদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় 'সময়ই অর্থের' ধারণাটি। ১৮শ' সালের গোড়াতে কারখানার মালিকরা তৈরি করেন 'কল ঘড়ি' (Mill Clock)। 'বদমায়েশ ঘড়ি কেন ধীরে ঘোরে'- কর্মক্লান্ত শ্রমজীবীর খিস্তি এখনও কারখানার দেয়ালে কান পাতলে শোনা যাবে। ঘড়িই জানিয়ে দিত কোন সময়টা চাকরিদাতার। কোনটা শ্রমিকের। সময়ের নিখুঁত হিসাব জানাটা সমাজে তাই জরুরি হয়ে পড়লো। পার্থক্য গড়ে উঠল আদিম সমাজের সঙ্গে আধুনিক জটিল সমাজের।

অষ্টাদশ শতকে রোমাঞ্চপ্রিয় অভিযাত্রীদের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ একটি সর্বজনীন সময়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সে সময় কোনো সময় বলয় (time zone) ছিল না। বিশ্বজুড়ে অসংখ্য স্থানীয় সময় মিলেমিশে একটা এলেবেলে অবস্থা তৈরি করেছিল। নাবিকদের সুবিধার জন্য কোনো মূল মধ্যরেখা এবং ২৪ ঘন্টা সময় গণনার ব্যবস্থা ছিল না। জাহাজগুলো নিজেদের দেশের স্থানীয় সময় নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

১৮৮৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সম্মেলন বসে। আমেরিকা ও ব্রিটেন আবেদন জানায়, ব্রিটেনের গ্রিন উইচে অবস্থিত রাজকীয়

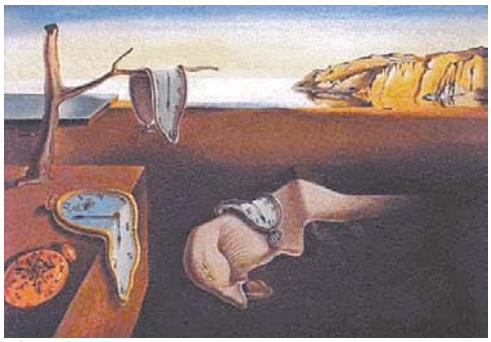

ÔUvBgÕ: mvjfv`i `wj mgq‡K †`‡L‡Qb miwiqwj‡÷i `wó‡Z; AvBb÷vBb : Avgj e`‡j w`‡q‡Qb mgq m¤ú‡K Avgv‡`i cPwjZ avi Yv

মানমন্দিরকে শূন্য ডিগ্রি দ্রাঘিমা ধরে আন্তর্জাতিক সময় নির্ধারণের। এর আগে অবশ্য মিশরের গ্রেট পিরামিড এবং জেরুসালেমের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। ফরাসি প্রতিনিধিরা প্যারিসের পক্ষে জোরালো মত রাখেন। গ্রিন উইচই জেতে। যদিও ফরাসি মানচিত্রে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এর স্বীকৃতি মেলেনি। সুসজ্জিত প্যারিস মানমন্দিরে যদি ঢুঁ মারার সৌভাগ্য হয় তাহলে দেখবেন, সিলিং থেকে দস্তা নির্মিত ৩২টি পাত ঝুলছে। ফ্রান্সের জ্যোতির্বিদদের হাতে গড়া দ্রাঘিমা নির্দেশক। প্যারিস জিতলে আজকে হয়তো GMT-র স্থলে PMT-ই (প্যারিস মিন টাইম) হতো আমাদের প্রমাণ সময়।

এরপর আরো সংস্কার আসে। ১৮৮৩ তে মার্কিন সময়-বলয়, ১৮৮৪ সালে বৈশ্বিক সময়-বলয়, ১৯৯৫ সালে সূর্যালোক সংরক্ষণ সময় নির্ঘন্ট (Daylight Saving Time) ইত্যাদি। এই প্রপঞ্চগুলোর কল্যাণে 'সময়' আরো বেশি জেঁকে বসে আমাদের জীবনে।

একটা বাজি ধরা যাক। গত ৩ কোটি ৫০ লাখ বছরে যতগুলো সেকেন্ড ছিল, আজকের ১ সেকেন্ডকে তারচে' বেশি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে ভাগ করা সম্ভব। চমকে উঠলেন? ওঠারই কথা।

সময়ের সাথে সাথে সময়কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করার কলাকৌশল রপ্ত করেছে মানুষ। এক সেকেন্ডকে এখন এক মাইক্রোসেকেন্ড (এক সেকেন্ডের এক নিযুতভাগের এক ভাগ), ন্যানোসেকেন্ড (শতকোটি ভাগের একভাগ), পিকো সেকেন্ড (একের পিঠে বারো শূন্য বা এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ) এবং ফেমটো সেকেন্ডে (এক পিকোসেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ) ভাগ করা সম্ভব।

বাজি কে জিতল সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না নিশ্চয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেকেন্ডকে এত সূক্ষ্ম ভাগ করে কি লাভ? খালি চোখে আমাদের এক সেকেন্ডের পার্থক্য ধরতে পারাটাই যথেষ্ট। কিন্তু স্যাটেলাইট সংকেতের সাহায্যে যিনি

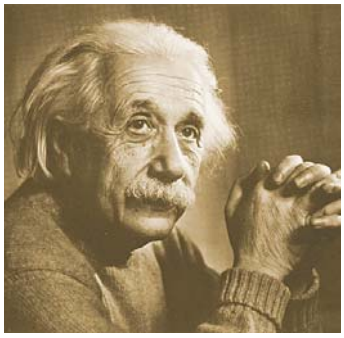

বিমান চালাচ্ছেন তার মাইক্রোসেকেন্ড জানা প্রয়োজন। মহাশূন্যে যিনি রকেট নিয়ে যাচ্ছেন তার প্রয়োজন ন্যানোসেকেন্ডের হিসাব। আর অণুর নিউক্লিয়াসের গতি পরিমাপ করছেন যে বিজ্ঞানী তার প্রয়োজন পিকোসেকেন্ড বা ফেমটোসেকেন্ডের হিসাব।

প্রযুক্তির উৎকর্ষতা মানুষকে সময়ের সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে সাহায্য করছে। ১৯৪৮ সালে আবিষ্কৃত হয় সেজিয়াম ঘড়ি। বলা হয় এটাই বিশ্বের নিখুঁততম ঘড়ি। সেজিয়াম নামে এক জাতীয় রুপালি সাদা ধাতুর পরমাণুর অনুরণন হিসাবে করে এই ঘড়ি সময় রক্ষা করে। ৪০ দশকেই বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, সেজিয়াম ধাতুর পরমাণুর ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট তাল বা ছন্দে দোল খায়। ঠিক পেন্ডুলামের মতো। এই দুলুনি গুনে সেজিয়াম ঘড়িতে সময় হিসাব করা হয়। ওয়াশিংটন ডিসির উত্তর-পশ্চিমে এক গাছপালা ভরা পাহাড়ের অভ্যন্তরে মার্কিন নৌবাহিনীর মানমন্দির। সেখানে আর্দ্রতা ও তাপ নিরোধক একটি বড় স্যুটকেস সাইজের বাক্সে রাখা আছে এক সেজিয়াম ঘড়ি। যার পরমাণু সেকেন্ডে দোল খায় ৯১৯,২৬,৩১,৭৭০ বার (সব সেজিয়াম পরমাণুই অবশ্য সমান দোল খায়)। এই মানমন্দিরের সাথে হিসাবে করেই পুরো আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যত্র সময় ঠিক করা হয়। এছাড়া, সেকেন্ডের দৈর্ঘ্য হিসাবের জন্য ব্যবহার করা হয় কলোরাডোতে সংরক্ষিত একটি সেজিয়াম ঘড়ি। নাম এনবিএস-৬ (NBS-6)। তিন লাখ বছরে এক সেকেন্ডও এদিক- সেদিক হবে না এই ঘড়ির- এতটাই নিখুঁত এটি।

সেজিয়াম ঘড়ি অর্থাৎ আণবিক ঘড়ি বদলে দিয়েছে সময় বা দূরত্ব পরিমাপের পদ্ধতি। বিশ্বজুড়ে দূরত্ব পরিমাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হয় মিটার। 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেকনোলজি'র (যারা এনবিএস-৬ এর দেখভাল করে) বিজ্ঞানীরা মিটারকে আলো দিয়ে মেপে দেখিয়েছেন। এখন ১ মিটার মানে ৩.৩৩৫৬৪০৯৫ ন্যানোসেকেন্ডে আলোর দূরত্ব (প্রায়)।

সময়ের হিসাব কেবল মানুষই রাখে, এমন নয়। আরো অনেকেই রাখে। প্রকৃতির নিজস্ব ঘড়ি আছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকলে সেই ঘড়িও যত্রতত্র পড়া যায়। ১৯৪৭ সালে মার্কিন রসায়নবিদ উইলার্ড লিবি খুঁজে পান এমনই এক ঘড়ি, ৫০ হাজার বছর বয়সী সবকিছুতেই যা টিকটিক্ করছে। নাম কার্বন ১৪ পরমাণু। বিজ্ঞানীরা জানেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই পরমাণু ক্ষয়ে যায়। কাজেই যে কোনো বস্তুর ক্ষয়প্রাপ্ত কার্বণ পরমাণু পরীক্ষা করে তার বয়স জানা সম্ভব যেমন জানা গেছে ফারাও রাজার মমির বয়স।

ভূবিজ্ঞানীরাও ইউরেনিয়াম, পটাশিয়াম অথবা রুবিডিয়ামের মতো তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় হিসাব করে গ্রহের বয়স নির্ধারণ করেছেন। গ্রান্ড ক্যানিয়নের তলায় পাওয়া গেছে ২০০ কোটি বছরের ইতিহাস। কানাডায় প্রায় ৪০০ কোটি বছরের পুরনো শিলা। চাঁদের শিলার বয়স ৪৫০ কোটি বছর তাও আমাদের জানা।

জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরাও কম যান না। তারা উঁকি দিয়েছেন সময়ের গর্ভে। দূরবর্তী গ্যালাক্সির আলোর দিকে তাকিয়ে জানতে চেষ্টা করছেন শতকোটি বছর আগের সময়কে। লন্ডনের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' গ্রন্থের প্রণেতা হকিংকে বলা হয়

বর্তমান সময়ের আইনস্টাইন। হকিং বলেছেন, ১৫ শত কোটি বছর আগে মহাবিশ্ব ছিল অকল্পনীয়ভাবে সংকুচিত ও ঘন। এর আগে আমরা যাকে সময় বলি, তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।'

দেহঘড়িও কম যায় না। এক সময় দেয়াল ঘড়ি ছিল না। সে সময় দেহঘড়িই জানিয়ে দিত কোনটা খাওয়ার সময়, কোনটা ঘুমুতে যাবার। মুখের তালুর ওপরে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশে অবস্থিত আমাদের দেহঘড়ি। দেহের নিজস্ব সময়চক্র 'সার্কেডীয় ছন্দে' (Circadian Rhythm) চলছে এই ঘড়ি। দেহের দিবারাত্র হচ্ছে ২৫ ঘন্টায় (১৫ মিনিট কম বা বেশি)।

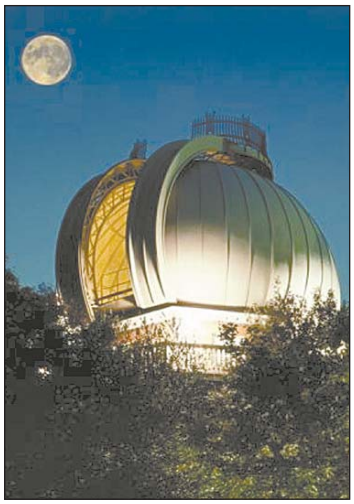

(ev‡g) wMb DB‡Pi iq¨vj AeRvi‡fUwi|
wgmixqiv mgq‡K eQi, gvm, mßvn I N›Uvq wef³ K‡iwQj

দেহঘড়ির সঙ্গে দেয়াল ঘড়ির পার্থক্য ১ ঘন্টা। কেন? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রকৃতির সঙ্গে এই অসঙ্গতি আমাদের মাঝে এক ধরনের সতর্কতা তৈরি করে, যা বেঁচে থাকার জন্য জরুরি।

এদিকে বুড়ো পৃথিবীও সময়ের হিসাব রাখে। যদিও বয়সের কারণে তার গতি কমছে। জোয়ার-ভাটা, আবহাওয়ামন্ডলের বিন্যাস, সমুদ্র স্রোত, মেরু অঞ্চলের বরফের তারতম্য পৃথিবীর আবর্তনকে কমিয়ে দিচ্ছে। ৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবী তার নিজ কক্ষে আবর্তন করতো ২০ ঘন্টায়। অর্থাৎ দিন রাত হতো ২০ ঘন্টায়। আরো ২০ কোটি বছর পর দিন রাত হবে ২৫ ঘন্টায়।

দেয়াল ঘড়ি মিলে যাবে দেহঘড়ির সঙ্গে। কি ঘটবে তখন? আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে হয়তো। সময়ের হিসাবেও গড়মিল দেখা দিতে পারে। এবং নিঃসন্দেহে প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় থাকা মুহূর্তগুলো আরো খানিকটা প্রলম্বিত হবে।

আইজ্যাক নিউটন মনে করতেন, সময়ের নিজস্ব জীবন আছে। অনেকটা ঈশ্বরপ্রদত্ত ব্যাপার। প্রকৃতির মাঝে নিজের স্থান করে রেখেছে। আইনস্টাইন এসে বদলে দিলেন এই ধারণা। তার আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে সময় ধ্রুবক নয়। এটি আপেক্ষিক। নির্ভর করে আমরা কত জোরে ছুটছি তার ওপর। সময় নয় আলোর গতিই হচ্ছে একমাত্র ধ্রুবক। যার বেগ সেকেন্ড ১৮৬২৮২ মাইল। বলা যায়, আলোর গতিই আইনস্টাইনের সময়মাপক ঘড়ি। কেননা আলোর গতি কখনো বাড়ে কমে না।

গতির সাপেক্ষে সময়ের আপেক্ষিকতা প্রমাণের জন্য এক অভিনব গবেষণা চালানো হয় ১৯৭১ সালে। আইনস্টাইনের তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, গতি যত বাড়বে, ঘড়ি তথা সময় তত শ্লথ হবে। গতি বাড়তে বাড়তে আলোর গতির সমান হলে সময় স্থির হয়ে যাবে। এটা পরীক্ষার জন্য জেটবিমানে চারটি সেজিয়াম ঘড়ি বসিয়ে পৃথিবী ঘুরিয়ে আনা হয়। একবার পূর্ব থেকে পাশ্চিমে। এরপর পশ্চিম থেকে পূর্বে। পৃথিবী যেহেতু পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘোরে তাই পূব-পশ্চিমে ভ্রমণকারী বিমানগুলো ছুটে বেশি গতিতে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছিলেন, এর ফলে এই বিমানগুলোর ঘড়ি পশ্চিম-পূর্বে ভ্রমণকারী বিমানগুলোর চেয়ে কম চলবে। দেখা গেছে তাই হয়েছে। দ্রুতগামী বিমানের সেজিয়াম ঘড়িগুলো ৩৩২ ন্যানোসেকেন্ড স্লো হয়ে গিয়েছিল।

এখানে একটা প্যাঁচ আছে। আলো এবং সময় উভয়েই মাথা নত করে মাধ্যাকর্ষণের কাছে। বস্তুর ঘনত্ব যত বেশি তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তত বেশি। মাধ্যাকর্ষণ আলোর গতিকে পর্যন্ত টেনে ধরে। পৃথিবীতে আলো যে বেগে চলে, বৃহস্পতি গ্রহে চলবে তারচেয়ে কম বেগে। কেননা বৃহস্পতি গ্রহে পদার্থের পরিমাণ ৩১৮ গুণ বেশি। এখানে সেজিয়াম ঘড়িও লক্ষণীয়ভাবে ধীরে চলবে। আলোর গতি দিয়ে মাপা মিটারের হিসাবও বদলে যাবে।

ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরে ঘটছে আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ব্ল্যাকহোলগুলো আসলে সুবিশাল নক্ষত্র। এসব সাবেক নক্ষত্র আলো বিকিরণ করতে করতে সংকুচিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে ঘন ও সংকুচিত নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই বেড়ে যায় যে আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। অর্থাৎ ব্ল্যাক হোলগুলোতে আলো নড়াচড়া করতে পারে না। তার মানে ব্ল্যাকহোলে সময় একদম স্থির।

সময় ভ্রমণ কি সম্ভব? সময় সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনার সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন এটি। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী আমাদের এই ধারণা দিয়েছে, সময় ভ্রমণ বা টাইম ট্রাভেল সম্ভব। অনেকেই আলেকজান্ডারের সঙ্গে দিগ্বিজয়ের কিংবা শেক্সপিয়রের সঙ্গে কফি পানের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন মনে মনে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো আশার বাণী শোনাতে পারছেন না। বিজ্ঞানের একটা মূল তত্ত্ব হচ্ছে: প্রকৃতি ক্রমেই বিশৃঙ্খল হচ্ছে। কাজেই অতীতে ফিরে গিয়ে ভুল শুধরে আসবেন, এমন আশা না করাই ভালো। তবে পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকায় 'সময় ভ্রমণ'কে সম্ভব করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই ক্ষুদ্র কণিকা বা পদার্থকে তার পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ শক্তিতে পরিণত করেছেন। জন্ম নেয়ার পর আবার মাতৃগর্ভে ফিরে যাওয়ার মতো ব্যাপার এটি। এবং এখন পর্যন্ত সময় ভ্রমণে সাফল্য এতটুকুই।

সময় ভ্রমণ বা সময়কে উল্টে দেয়া সম্ভব না হলেও এর সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা চলছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছে 'ট্রান্স টাইম' নামে এক প্রতিষ্ঠান। তারা মৃত মানুষের দেহকে তরল নাইট্রোজেনপূর্ণ ইস্পাতের ক্যাপসুলে সংরক্ষণ করছে। যুক্তি হচ্ছে একদিন মানুষ মৃত্যুকে জয় করবে। সেদিন এই অবিকৃত দেহগুলো আবার বাঁচিয়ে তুলবেন বিজ্ঞানীরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয়ুও বাড়ছে। প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে। উন্নত বিশ্ব ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছে ২৪ ঘন্টার সমাজে (24 hours Society)।

সময়ের সাতকাহন এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। শুরু করেছিলাম প্রশ্ন দিয়ে 'সময় কি'? উত্তর পাওয়া গেল? উত্তর কি আদৌ পাওয়া যাবে? মানুষের হাতে তৈরি সময় এখন তার অস্থিমজ্জার গভীরে। কি প্রয়োজন একে আলাদাভাবে সংজ্ঞায় ফেলার? পহেলা বৈশাখ আসছে। শাড়ি, মেলা আর বৈশাখী গানে উদযাপিত হবে দিনটি। সময়ের অদম্য প্রেম ভুলিয়ে দেবে দিনক্ষণ আমরাই সৃষ্টি করেছি, সময় নয়।